আত তীন

৯৫

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আত্‌তীন (اَلتِّيْنِ) –কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

কাতাদাহ এটিকে মাদানী সূরা বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। একটি বক্তব্যে একে মক্কী এবং অন্যটিতে মাদানী বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মক্কী গণ্য করেছেন। এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, এই সূরায় মক্কা শহরের জন্য هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এই নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মদীনায় এটি নাযিল হতো তাহলে মক্কার জন্য "এই শহরটি" বলা ঠিক হতো না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটিকে মক্কা মু'আয্‌যমারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময় কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এমন কোন চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মতো একই বর্ণনাভংগী পাওয়া যায়। এই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির স্বীকৃতি। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তব বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়েছেন। (আল বাকারাহ ৩০–৩৪, আল আরাফ ১১, আল আন'আম ১৬৫, আল হিজর ২৪–২৯, আন নাম্‌ল ৬২, সাদ ৭১–৭৩ আয়াত) কোথাও বলা হয়েছে ঃ মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক হয়েছে যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কারো ছিল না। (আল আহযাব ৭২ আয়াত) আবার কোথাও বলা হয়েছে ঃ আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সৃষ্টির ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনী ইসরাঈল ৭০ আয়াত) কিন্তু এখানে বিশেষ করে নবীগণের আত্মপ্রকাশের

স্থানগুলোর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, মানুষকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে নবুওয়াতের মত সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদা সম্পন্ন লোক জন্ম নিয়েছে। আর এই নবুওয়াতের চাইতে উঁচু পদমর্যাদা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টি লাভ করেনি।

এরপর বলা হয়েছে, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর দুষ্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে বেং নৈতিক অধপতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিম্ন গভীরতায় পৌছে যায়। সেখানে তাদের চাইতে নীচে আর পৌছতে পারে না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতন থেকে রক্ষা পায়। তাদেরকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার অপরিহার্য দাবী যে উন্নত স্থান সে স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এই দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কারণ মানুষের সমাজে সব জায়গায় সবসময় এটি দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে এই বাস্তব সত্যটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যখন এই দু'টি আলাদা আলাদা এবং পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায় তখন কাজের প্রতিদানের ব্যাপারটি কেমন করে অস্বীকার করা যেতে পারে? যারা অধপতনের গভীর গর্তে নেমে গেছে এবং যারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌছে গেছে তাদেরকে যদি কোন প্রতিদান না দেয়া হয় এবং উভয় দলের পরিণতি একই হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর রাজত্বে কোন ইনসাফ নেই। অথচ শাসককে ইনসাফ অবশ্যি করতে হবে, এটা মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক প্রকৃতির দাবী। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যিনি সকল শাসকের বড় শাসক তিনি ইনসাফ করবেন না, একথা কেমন করে কল্পনা করা যেতে পারে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝٣
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥
اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

তীন ও যায়তূন,[1] সিনাই পর্বত[2] এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা) কসম। আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয়।[3] তারপর তাকে উল্টো ফিরিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছিয়ে দিয়েছি[4] তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করতে থাকে। কেননা তাদের রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনদিন শেষ হবে না।[5] কাজেই (হে নবী!) এরপর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে?[6] আল্লাহ কি সব শাসকের চাইতে বড় শাসক নন?[7]

১. এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে অনেক বেশী মতবিরোধ দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরামাহ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জাবের ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখ্‌য়ী রাহেমাহুমুল্লাহ বলেন, তীন বা ইন্‌জীর (গোল হাল্‌কা কাল্‌চে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতে এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তূন বলতেও এই যায়তূনই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তেল বের করা হয়। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এরি সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। যেসব তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন তারা তীন ও যায়তূনের বিশেষ গুণাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এসব গুণের কারণে মহান আল্লাহ এই দু'টি ফলের কসম খেয়েছেন। সন্দেহ নেই, একজন সাধারণ আরবী জানা ব্যক্তি তীন ও যায়তূন শব্দ শুনে সাধারণভাবে আরবীতে এর পরিচিত অর্থটিই গ্রহণ করবেন। কিন্তু দু'টি কারণে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। এক, সামনে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। আর দু'টি ফলের সাথে দু'টি শহরের কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন মিল নেই। দুই, এই চারটি জিনিসের কসম খেয়ে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের আলোচনা তার সাথে খাপ খায় কিন্তু এই ফল দু'টির

আলোচনা তার সাথে মোটেই খাপ খায় না। মহান আল্লাহ কুরআন মজীদে যেখানেই কোন জিনিসের কসম খেয়েছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা গুণের জন্য খাননি। বরং কসম খাবার পর যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়ের জন্যই কসম খেয়েছেন। কাজেই এই ফল দু'টির বিশেষ গুণাবলীকে কসমের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায় না।

অন্য কোন কোন তাফসীরকার তীন ও যায়তূন বলতে কোন কোন স্থান বুঝিয়েছেন। কা'ব আহবার, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ বলেন, তীন বলতে দামেশ্‌ক এবং যায়তূন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রা) একটি উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তীন বলতে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম জূদী পাহাড়ে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। আর যায়তূন বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ আরবের মনে "ওয়াত্ তীন্ ওয়ায্ যায়তূনে" (وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ) শব্দগুলো শুনামাত্রই এই অর্থ উকি দিতে পারতো না এবং তীন ও যায়তূন যে এই দু'টি স্থানের নাম কুরআনের প্রথম শ্রোতা আরববাসীদের কাছে তা মোটেই সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত ছিল না।

তবে যে এলাকায় যে ফলটি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো অনেক সময় সেই ফলের নামে সেই এলাকার নামকরণ করার রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুসারে তীন ও যায়তূন শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ সে যুগের আরবে তীন ও যায়তূন উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, যামাখ্‌শারী ও আলুসী রাহেমাহমুল্লাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জারীর প্রথম বক্তব্যটিকে অগ্রাধিকার দিলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তূন মানে এই ফল দু'টি উৎপাদনের এলাকাও হতে পারে। হাফেজ ইবনে কাসীরও এই ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য মনে করেছেন।

২. আসলে বলা হয়েছে তূরে সীনীনা। (طُوْرِ سِيْنِيْنَ) হচ্ছে সিনাই উপদ্বীপের দ্বিতীয় নাম। একে সাইনা বা সীনাই এবং সীনীনও বলা হয়। কুরআনে এক জায়গায় "তূরে সাইনা" (طور سيناء) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে যে এলাকায় তূর পর্বত অবস্থিত তা সীনাই নামেই খ্যাত। তাই আমি অনুবাদে সীনাই শব্দ ব্যবহার করেছি।

৩. একথাটির ওপরই তীন ও যায়তূনের এলাকা অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এবং তূর পর্বত ও মক্কার নিরাপদ শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে, একথার মানে হচ্ছে এই যে, তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌষ্ঠব দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের চিন্তা, উপলব্ধি জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। তারপর যেহেতু নবীগণই হচ্ছেন মানব জাতির প্রতি এই অনুগ্রহ ও পূর্ণতাগুণের সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের নমুনা এবং মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে নবুওয়াত দান করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন তার জন্য এর চাইতে বড় মর্যাদা আর কিছুই হতে পারে না, তাই মানুষের সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর নবীদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে। সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত অসংখ্য নবীর

আবির্ভাব ঘটে। তূর পর্বতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন। আর মক্কা মু'আযযমার ভিত্তি স্থাপিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈলের (আ) হাতে। তাঁদেরই বদৌলতে এটি আরবের সবচেয়ে পবিত্র কেন্দ্রীয় নগরে পরিণত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) এ দোয়া করেছিলেন ঃ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا "হে আমার রব! একে একটি নিরাপদ শহরে পরিণত করো।" (আল বাকারাহ ১২৬) আর এই দোয়ার বরকতে আরব উপদ্বীপের সর্বত্র বিশৃংখলার মধ্যে একমাত্র এই শহরটিই আড়াই হাজার বছর থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কাজেই এখানে বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে ঃ আমি মানব জাতিকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি যে, তার মধ্যে নবুওয়াতের ন্যায় মহান মর্যাদার অধিকারী মানুষের জন্ম হয়েছে।

৪. মুফাসসিরগণ সাধারণত এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, আমি তাকে বার্ধক্যের এমন এক অবস্থার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা করার, বুঝার ও কাজ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। দুই, আমি তাকে জাহান্নামের সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বক্তব্যের যে উদ্দেশ্যটি প্রমাণ করার জন্য এই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে এই দু'টি অর্থকে তার জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যেতে পারে না। সূরাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, আখেরাতে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা যে যথার্থ সত্য তা প্রমাণ করা। এদিক দিয়ে মানুষদের মধ্যে থেকে অনেককে চরম দুর্বলতম অবস্থায় পৌছিয়ে দেয়া হয় এবং মানুষদের একটি দলকে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে—এ দু'টি কথার একটিও এই অর্থের সাথে খাপ খায় না। প্রথম কথাটি শাস্তি ও পুরস্কারের প্রমাণ হতে পারে না। কারণ ভালো ও খারাপ উভয় ধরনের লোক বার্ধক্যের শিকার হয়। কাউকে তার কাজের শাস্তি ভোগ করার জন্য এই অবস্থার শিকার হতে হয় না। অন্যদিকে দ্বিতীয় কথাটি আখেরাতে কার্যকর হবে একে কেমন করে এমন সব লোকের কাছে হিসেবে পেশ করা যেতে পারে যাদের থেকে আখেরাতে শাস্তি ও পুরস্কার লাভের ব্যবস্থার পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য এই সমস্ত যুক্তি–প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে? তাই আমার মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার পর যখন মানুষ নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুষ্কৃতির পথে ব্যবহার করে তখন আল্লাহ তাকে দুষ্কৃতিরই সুযোগ দান করেন এবং নিচের দিকে গড়িয়ে দিতে দিতে তাকে এমন নিম্নতম পর্যায়ে পৌছিয়ে দেন যে, অন্য কোন সৃষ্টি সেই পর্যায়ে নেমে যেতে পারে না। এটি একটি বাস্তব সত্য। মানুষের সমাজে সচরাচর এমনটি দেখা যায়। লোভ, লালসা, স্বার্থবাদিতা, কামান্ধতা, নেশাখোরী, নীচতা, ক্রোধ এবং এই ধরনের অন্যান্য বদ স্বভাব যেসব লোককে পেয়ে বসে তারা সত্যিই নৈতিক দিক দিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌছে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু মাত্র একটি কথাই ধরা যাক। একটি জাতি যখন অন্য জাতির প্রতি শত্রুতা পোষণ করার ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায় তখন সে হিংস্রতায় দুনিয়ার হিংস্র পশুদেরকেও হার মানায়। একটি হিংস্র পশু কেবলমাত্র নিজের ক্ষুধার খাদ্য যোগাড় করার জন্য অন্য পশু শিকার করে। যে ব্যাপকভাবে পশুদের হত্যা করে চলে না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে চলছে। পশুরা কেবলমাত্র নিজেদের নখর ও দাঁত ব্যবহার করে শিকার করে। কিন্তু এই সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষ নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বন্দুক, কামান, ট্যাংক, বিমান, আণবিক বোমা, উদজান বোমা এবং অন্যান্য অসংখ্য মারণাস্ত্র তৈরী করেছে এবং সেগুলোর

সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সুবিশাল জনপদগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। পশুরা কেবল আহত বা হত্যা করে। কিন্তু মানুষ নিজেদেরই মতো মানুষকে নির্যাতন করার জন্য এমন সব ভয়াবহ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যেগুলোর কথা পশুরা কোন দিন কল্পনাও করতে পারে না। তারপর নিজেদের শত্রুতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তারা নীচতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা মেয়েদের উলংগ করে তাদের মিছিল বের করে। এক একজন মেয়ের ওপর দশ বিশ জন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাপ, ভাই ও স্বামীদের সামনে তাদের স্ত্রী ও মা–বোনদের শ্লীলতাহানি করে। মা–বাপের সামনে সন্তানদেরকে হত্যা করে। নিজের গর্ভজাত সন্তানদের রক্ত পান করার জন্য মাকে বাধ্য করে। মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে এবং জীবন্ত কবর দেয়। দুনিয়ায় পশুদের মধ্যেও এমন কোন হিংস্রতম গোষ্ঠী নেই যাদের বর্বরতাকে কোন পর্যায়ে মানুষদের এই বর্বরতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের অন্যান্য বড় বড় গুণের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যায়। এগুলোর মধ্য থেকে যেটির দিকে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে সেটির ব্যাপারেই নিজেকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি প্রমাণ করেছে। এমনকি ধর্ম যা মানুষের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, তাকেও সে এমন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, যার ফলে সে গাছপালা, জীব–জন্তু ও পাথরের পূজা করতে করতে অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে নারী ও পুরুষের লিংগেরও পূজা করতে শুরু করেছে। দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্ম মন্দিরে দেবদাসী রাখছে। তাদের সাথে ব্যভিচার করাকে পূণ্যের কাজ মনে করছে। যাদেরকে তারা দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তাদের সাথে সম্পর্কিত দেবকাহিনীতে এমন সব কুৎসিত কাহিনী জুড়ে দিয়েছে যা জঘন্য ও নিকৃষ্টতম মানুষের জন্যও লজ্জার ব্যাপার।

৫. যেসব মুফাস্সির "আসফালা সা-ফেলীন" (أَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ) –এর অর্থ করেছেন, বার্ধক্যের এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ নিজের চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞান–বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এই আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন, "কিন্তু যারা নিজেদের যৌবনকালে ও সুস্থাবস্থায় ঈমান এনে সৎকাজ করে তাদের জন্য বার্ধক্যের এই অবস্থায়ও সেই একই নেকী লেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী তারা প্রতিদানও পাবে। বয়সের এই পর্যায়েও তারা ঐ ধরনের সৎকাজগুলো করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কিছুই কম করা হবে না।" আর যেসব মুফাস্সির "আসফালা সাফেলীনের" দিকে উল্টো ফিরিয়ে দেবার অর্থ 'জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা' করেছেন তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ "ঈমান এনে যারা সৎকাজ করে তারা এর বাইরে তাদেরকে এই পর্যায়ে উল্টো ফেরানো হবে না। বরং তারা এমন পুরস্কার পাবে যার ধারাবাহিকতা কোনদিন খতম হবে না।" কিন্তু এই সূরায় শাস্তি ও পুরস্কারের সত্যতার পক্ষে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার সাথে এই উভয় অর্থের কোন মিল নেই। আমার মতে এই আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, মানুষের সমাজে যেমন সাধারণভাবে দেখা যায়, যেসব লোকের নৈতিক অধপতন শুরু হয় তারা অধপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদের নীচে চলে যায়, ঠিক তেমনি প্রতি যুগে সাধারণভাবে দেখা যায়, যারা আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজের কাঠামোয় নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নেয় তারা এই পতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছিলেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই তারা অশেষ শুভ প্রতিদানের অধিকারী। অর্থাৎ তারা এমন পুরস্কার পাবে, যা তাদের যথার্থ পাওনা থেকে কম হবে না এবং যার ধারাবাহিকতা কোনদিন শেষও হবে না।

৬. এই আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এও হতে পারে : "কাজেই (হে মানুষ) এরপর কোন্ জিনিসটি তোমাকে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে?" উভয় অর্থের ক্ষেত্রে লক্ষ ও মূল বক্তব্য একই থাকে। অর্থাৎ মানুষের সমাজে প্রকাশ্যে দেখা যায় সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্ট মানুষদের একটি দল নৈতিক অধপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদেরও নীচে পৌঁছে যায় আবার অন্য একটি দল সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতনের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে এবং মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ অবস্থায় পুরস্কার ও শাস্তিকে কেমন করে মিথ্যা বলা যেতে পারে? বুদ্ধি কি একথা বলে, উভয় ধরনের মানুষের একই পরিণাম হবে? ইনসাফ কি একথাই বলে, অধপাতে যেতে যেতে নীচতমদেরও নীচে যারা পৌঁছে যায় তাদেরকে কোন শাস্তিও দেয়া যাবে না এবং এই অধপতন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে যারা পবিত্র জীবন যাপন করে তাদেরকে কোন পুরস্কারও দেয়া যাবে না? এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ - مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ -

"আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফায়সালা করছো? (আল্ কলম ৩৫-৩৬ আয়াত)

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

"দুষ্কৃতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন লোকদের মতো করে দেবো যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে।" (আল জাসিয়া ২১ আয়াত)

৭. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার ছোট ছোট শাসকদের থেকেও তোমরা চাও এবং আশা করে থাকো যে, তারা ইনসাফ করবে, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবে এবং ভালো কাজ যারা করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে তখন আল্লাহর ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? তিনি কি সব শাসকের বড় শাসক নন? যদি তোমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় শাসক বলে স্বীকার করে থাকো তাহলে কি তাঁর সম্পর্কে তোমরা ধারণা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না? তাঁর সম্পর্কে কি তোমরা এই ধারণা পোষণ করো যে, তিনি মন্দ ও ভালোকে একই পর্যায়ে ফেলবেন? তোমরা কি মনে করো তাঁর দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে খারাপ কাজ করবে আর যারা সবচেয়ে ভালো কাজ করবে তারা সবাই মরে মাটির সাথে মিশে যাবে। কাউকে তার খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে না এবং কাউকে তার ভালো কাজের পুরস্কারও দেয়া হবে না?

ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনযির, বায়হাকী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন "ওয়াত তীনে ওয়ায্‌যায়তূনে" সূরা পড়তে পড়তে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ আয়াতটিতে পৌঁছে তখন যেন সে বলে। بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (হাঁ, এবং আমি তার ওপর সাক্ষদানকারীদের একজন)। আবার কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই আয়াতটি পড়তেন, তিনি বলতেন, سُبْحٰنَكَ فَبَلٰى (হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। আর তুমি এই যা বলছো তা সত্য।